শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিকের লেখাপড়ায় অগ্রাধিকার দিন

আব্দুল মান্নান খান

শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে। তিনগুণ বাড়াতে হবে। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণা

খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। সুধীজনরা এসব কথা বলছেন এবং পত্রপত্রিকায় তা আসছে। কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত। এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন চাকরি জীবন শেষ করে আসার কিছু অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে আগে নজর দিতে হবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে। মাত্র বছর পাঁচেক আগে ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে।' এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যা শেখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। ১১ বছরের স্কুলজীবনে ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের। কাছাকাছি সময়ে আরেকটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, তৃতীয় শ্রেণীর ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণী মান অনুযায়ী বাংলা পড়তে পারে না। পঞ্চম শ্রেণীতে তা বেড়ে হয় ৭৭ শতাংশ। মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে পড়া ও লেখার সক্ষমতা অর্জনে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেগে যায়।

যা হোক, ইতোমধ্যে শিক্ষার এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে তা বোধ করি বলা যাবে না। কাজেই সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে শুরুটা করতে হবে প্রাইমারি থেকে। ব্যয় বাড়াতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। এখান থেকেই নিতে হবে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ। এর জন্য যেটা করা প্রয়োজন হবে তার একটা রূপরেখা এরকম হতে

পারে যেমন– ১. একটা শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে শতভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে। ২. সব শিশুর লেখাপড়া অভিন্ন কারিকুলামে হতে হবে। ৩. ব্যাপক হারে দেশে আবাসিক স্কুল গড়ে তুলতে হবে। ৪. স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিত্তবান অভিভাবকদের ডোনেশন দিতে হবে। ৫. নিকটতম স্কুলে শিশুদের পড়াতে হবে।

এবার একটু এর বিস্তারিত দেখা যাক–

১. একটা শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে শতভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে–একটা শ্রেণী পর্যন্ত বলতে অষ্টম, নবম, দশম এর যে কোনো একটা শ্রেণী হতে পারে। এবং এখানেই হতে পারে তাদের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। কেননা সবাই এর পরের ধাপে লেখাপড়া করতে যাবে না। আবার এর আগে কাউকে ছেড়েও দেয়া যাবে না। দিলে আগেরটা বৃথা যাবে। মানসম্মতভাবে এটুকু হলেই যে কেউ একজন লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে। গোটা জনগোষ্ঠী একদিন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে।

এখানেই হবে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। হাতে পাবে একখানা সনদ। এই সনদ অর্জন হবে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক মানে বাধ্যতামূলক। এই সনদেই থাকবে এর পরে সে কী করবে, উচ্চশিক্ষায় যাবে নাকি অন্য কোন পেশায় যাবে। এতে একটা সময় আসবে যখন ওই সনদ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতে পারবে না। ফলে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। ২. সব শিশুর লেখাপড়া অভিন্ন কারিকুলামে হতে হবে–দেশ গড়তে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। গোড়ায় গলদ থাকলে সেটা হোঁচট খাবে পদে পদে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা একটা অভিন্ন কারিকুলামের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে। একই ধারায় চলতে হবে দেশের ওই প্রাথমিক শিক্ষা। একই ধারার মনমানসিকতায়

গড়ে তুলতে হবে তাদের। অভিন্ন কারিকুলামের অধীনে দেশের সব শিশুকে আনা একটা কঠিন কাজ ঠিকই আবার কঠিনও না। কঠিন না এই অর্থে যে, বাংলাদেশ একটা ভাষারাষ্ট্র-জাতিরাষ্ট্র। কাজটা করতে এখানেই রয়েছে আমাদের সুবিধা। আমরা এক ভাষায় কথা বলি। ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি। আমাদের ভাষাদিবস একুশে ফেব্রুয়ারিই এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

আর কাজটা কঠিন ধনী-গরিব বৈষম্যের কারণে যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বিদ্যমান ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারলে কঠিন কিছুই না। শিক্ষার ভিত মজবুত করতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষিত জাতি গড়তে চাইলে এই অভিন্ন কারিকুলামের মধ্যে আমাদের আসতেই হবে। ৩. ব্যাপক হারে দেশে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে–এখান থেকেই শিক্ষার্থীরা যার যার লাইনে হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখে বেরিয়ে আসবে। যে শিক্ষার্থীর যেদিকে ঝোঁক থাকবে সেটায় সে হাতে-কলমে শিখে বের হবে। সবাই তো আর উচ্চশিক্ষায় যাবে না। সেটা হয়ও না। তবে কাজ তো করে খেতে হবে সবাইকে। গ্রামে-গঞ্জে অনগ্রসর এলাকায় সবখানে গড়ে তুলতে হবে আবাসিক স্কুল। এতে শহরের ওপর চাপ কমবে। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ কমে যাবে। বায়ুদূষণের হাত থেকে শিশুরা রক্ষা পাবে। অভিভাবকদের শ্রমঘণ্টা বেঁচে যাবে। দুর্নীতির ছোবল থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করা যাবে। যার জন্য প্রয়োজন হবে মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া ৪. স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিত্তবান অভিভাবকদের ডোনেশন দিতে হবে–এখন কথা হলো বিত্তবান কারা। এই ইস্যুতে বিত্তবানদের শনাক্ত করা কোনো কঠিন কাজ নয়। স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সবাই তাদের চেনে। এর একটা তালিকাও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়

থেকে করে নেয়া যায়। ইচ্ছা থাকলে কঠিন কিছু না। ইনকাম ট্যাক্স অফিসও কাজে লাগতে পারে। বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীকে। পাঠ্যপুস্তক দেয়া হচ্ছে এর একটা ভালো দিক আছে। পাঠদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না অসাধু ব্যবসায়ীরা। মজুত গড়ে তুলে বা নানা কারসাজিতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেউ। এখানে যে অনিয়মটা করা হচ্ছে তা হলো সচ্ছল বিত্তবান অভিভাবকদের সন্তানদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেয়া, এটা কেন করা হবে। গোটা একটা স্কুল নিজ খরচে চালাতে সমর্থ যে অভিভাবক তার সন্তানও পাচ্ছে এই বই এটা কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষণ হতে পারে না। তাও আবার দীর্ঘ বছর ধরে। এই টাকাটা দিয়ে অনেক গরিব মেধাবী শিশুর শিক্ষার জন্য কত কিছুই করা যেতে পারত। এখন বিত্তবান অভিভাবকদের কাছ থেকে যদি উন্নয়ন তহবিলে টাকা নেয়া হয় সেটা অযৌক্তিক হতে পারে না। প্রত্যেকেই চাইবেন তার সন্তান যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করবে সেটা ভালোভাবে সুচারুরূপে চলুক। এই যে নোট-গাইড, কোচিং, সহায়ক গ্রন্থ, প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এরকম নানাভাবে যদি কোনো অভিভাবককে টাকা ঢালতে না হয় তাহলে স্কুলে ডোনেট করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই না একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৫. বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে সব শিশুর লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক করতে হবে–স্লোগান তুলতে হবে, কোনো স্কুলই খারাপ না। এরিয়ার সব শিশু যখন এক স্কুলে পড়বে তখন আর খারাপ স্কুল বলে যে প্রচারটা করা হয় তা আপনা থেকেই উবে যাবে। এ স্কুলে লেখাপড়া হয় না ও স্কুলে ভালো শিক্ষক নেই এসব আর থাকবে না। তখন পাড়া-মহল্লার শিশুরা হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে। গাড়িঘোড়ার হয়রানি আর ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাবে। কেউ তার সন্তানকে তার বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে পড়াতে না চাইলে যেখানে পড়াতে চাইবেন সেখানে গিয়ে তাকে বসবাস করতে হবে। লেখাপড়ার ভিত মজবুত না হলে ওপর দিকে নড়বড়ে হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সবার জন্য মানসম্মত লেখাপড়ার বাস্তবায়ন চাইলে প্রাথমিকের লেখাপড়ায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এতে কিছু ভাবার অবকাশ নেই।

[**লেখক :** অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী]